দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - জীবন ও গল্প
(১৯১২ - ১৯৮৩)

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পে সু-মহিমায় অনেক শিল্পীই বিরাজমান, এঁদের মধ্যে কল্লোলোত্তর আধুনিক কালের অন্যতম লেখক হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। কেউ তাঁকে ভাবেন শব্দের যাদুকর আবার কেউ কেউ তাঁর রচনায় প্রগতিশীলতা ও মর্বিডিটির মতো বিপরীতধর্মী গুণ খুঁজে পান। তিনি ছোটগল্প-উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই নিজস্বভঙ্গীর স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি অনন্য। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বাংলা দেশের কুমিল্লায় তাঁর মাতুলালয়ে জন্ম হয়। কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁর বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে। ঢাকার সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী'তে তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। 'জ্যোৎস্না রায়' ছদ্মনামেও একসময় তিনি গল্প লিখেছেন। প্রথম গল্পগ্রন্থ পূর্বাশা প্রকাশন থেকে বের হয়েছিল। ১৯৩৬-এ 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'নদী ও নারী' গল্পটি আলোড়ন - সৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৮ সালে দেশ পত্রিকায় তাঁর প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস 'সূর্যমুখী' প্রকাশিত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র কৈশোরে তাঁর পিতার কাছে ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় আবৃত্তি শিখেছিলেন, এই সময় তিনি কিছু কিছু কবিতা রচনা করেন, পরিচিত মহলে কবি হিসেবে স্বীকৃতি তখন পেলেও কবিতা রচনাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। বাল্যকালে তাঁর সঙ্গী ছিল 'চারু-হারু' 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'ঠাকুরদার ঝুলি'। কিন্তু এগারো বারো বছর বয়সে তিনি ক্রমশ পরিচিত হলেন রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' 'মাধবীকঙ্কন'। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ইত্যাদি গ্রন্থের সঙ্গে। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস পাঠ করতে করতে তিনি ঝর্ণাগুহা বা গিরিবর্ত্ম নিয়ে পরিবেশ কল্পনা করতেন, এবং ছবি আঁকাতে মনোনিবেশ করতেন। চিত্রাঙ্কন বিদ্যাচর্চায় তিনি সঙ্গী হিসেবে পেয়ে

ছিলেন তাঁর ছোটমামাকে, যিনি চিত্রশিল্পে দক্ষ ছিলেন। এই বাল্যকাল থেকেই তিনি প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ আকণ্ঠ পান করতেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। তিতাসের জলে নৌকো-বাইচের সুতীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি আকর্ষণ বোধ করতেন না, অনেক বেশী আকর্ষণ বোধ করতেন খেজুর আর তালপালা ছড়ানো একটা শ্যাওড়া গাছের পেছনে লাল টকটকে আকাশের সূর্যাস্ত দেখতে। কৈশোরে সাহিত্য পাঠ আর ছবি আঁকা একত্রেই চলতে থাকে। রমেশচন্দ্রের পর জলধর সেনের রচনাপাঠ করে তিনি যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' পাঠে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই উপন্যাসের নায়ক উপীনের মতো তিনি তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা কোন নায়িকাকে খুঁজতে লাগলেন, চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজেকে তিনি একাত্ম করে নিতেন। তাঁর এই হাবভাব পিতার উকিল বন্ধুর ভাল লাগত না এবং ছেলের বিষয়ে সতর্ক হতে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রের বাবাকে উপদেশ দেন। পূর্ববাংলার একটি প্রাচীন শিক্ষায়তন অম্বদা-উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের তিনি যখন ছাত্র তখন পরীক্ষার উত্তর পত্রে মেহরকালী বাড়ির মেলায় ভ্রমণ বিষয়ে একটি রচনা লেখেন যা পাঠ করে বাংলা শিক্ষক সাহিত্যরসিক হরেন্দ্র ভট্টাচার্য - উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তখন থেকেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু হয়। তিনি যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়েন, সেই সময় আবৃত্তি করে এক খন্ড 'গল্পগুচ্ছ' উপহার পেয়েছিলেন যা পড়ে তিনি মুগ্ধ এবং আবিষ্ট হয়ে যান। প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র ইত্যাদিদের রচনা থেকে তিনি রসাস্বাদ করেছেন। কিন্তু এঁদের রচনার দ্বারা তিনি নিজ রচনার ক্ষেত্রে কখনই প্রভাবিত হননি। তাঁর রচনা এদের থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ভিন্ন গোত্রের। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'ই তাঁকে ছোটগল্প লিখতে প্রেরণা দিয়েছিল। এই বয়ঃসন্ধির মুহূর্তে তিনি মফস্বল শহরগুলি থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন হাতে লেখা পত্র-পত্রিকার জন্য ছোটগল্প লিখতে থাকেন। এরই মধ্যে তিনি নবমশ্রেণী থেকে দশমশ্রেণীতে পৌঁছে যান। কৈশোরের প্রচন্ড উদ্দীপনা ও উত্তেজনার ঝোঁকে তিনি এই সময় একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন,

এই পত্রিকায় সংকলিত হয়েছিল একমাত্র তাঁরই লেখা কবিতা গল্প এবং ওঁরই আঁকা ছবি। এই পত্রিকার একটি মাত্র সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩০ সালে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যখন মাত্র আঠারো বছরের তরুণ তখন কুমিল্লায় যুব সম্মিলন অনুষ্ঠানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন, এই সভায় উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র। এই উপলক্ষ্যে হাতে লেখা একটি পত্রিকা বের করেন সঞ্চয় ভট্টাচার্য। এই পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'অন্তরালে' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়, যার পাশে শরৎচন্দ্র মুহূর্তে প্রশস্তিসূচক মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত 'কলেজ ম্যাগাজিন'এ এই 'অন্তরালে' গল্পটিই ছাপা হয়েছিল। তিনি কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। জ্যোতিরিন্দ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিলায় থাকাকালীন তদানীন্তন বিখ্যাত নেতা ললিত বর্ধনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ সংঘের হাতে লেখা পত্রিকার পরিচালনা করেছেন, এই সময় পর্যাপ্ত পড়াশোনা করেছেন ও নাট্যাভিনয়ে নিজেকে সংযুক্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি অভিনয় করা এবং অভিনয় দেখা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেন। প্রথম যৌবনকালে তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজ প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে করতেন। এই সময় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ঢেউ হাওয়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্র এই সময় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। এর ফলে কুমিল্লার জেলে বন্দী থাকেন ছ'মাস এবং পুলিশি নির্যাতন সহ্য করেন। শিশুকাল থেকেই জ্যোতিরিন্দ্র অত্যন্ত ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। শৈশবে তাঁর ডাক নাম ছিল 'ধনু'। তাঁর শৈশব থেকেই এই ভাবুক চরিত্রকে পরিবারের কেউ-ই উপলব্ধি করতে পারেননি। যে শহরে তাঁরা থাকতেন সেখানে দুর্গাপ্রতিমা ভাসানের দিন তিতাসের জলে অসংখ্য নৌকো এসে ভিড় করতো। এই বিচিত্র দৃশ্যে আর পাঁচজন শিশুর মতো ভালো পোশাকে তিনি তিতাস নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন, কিন্তু কোন আকর্ষণ বোধ করতেন না। কোন্ দৃশ্য কোন্ গন্ধ তাঁকে আকুল করে তুলবে তিনি নিজেও সেটা সর্বদা বুঝতে পারতেন না।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সব ইন্দ্রিয়ের চেয়ে সব থেকে বেশী সক্রিয় ছিল ঘ্রাণেন্দ্রিয়। কবি জীবনানন্দ দাসেরও ঘ্রাণেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর ছিল। এই ইন্দ্রিয় সচেতনতায়, এই দুই শিল্পীর মানসিক নৈকট্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। জীবনানন্দের কবিতা পাঠ করে জ্যোতিরিন্দ্র প্রভাবিত হয়েছিলেন যার ছাপ তাঁর বিভিন্ন গল্পে রয়েছে। জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় গন্ধের পৌণঃপুনিক উল্লেখ রয়েছে। 'অবসরের গান' কবিতাতে পাওয়া যায় - 'মাঠের ঘাসের গন্ধ', 'শিশিরের ঘ্রাণ', 'শৈশবের ঘ্রাণ', 'রূপশালি ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ', 'ফলন্ত ধানের গন্ধ', 'ফুরোনো ক্ষেতের গন্ধ', 'রূপসী বাংলা'র একটি কবিতায় গন্ধ-এর অভিনব উল্লেখে জড়িয়ে থাকে রহস্য আর বিস্ময় - 'পাড়াগাঁর দু'পহর ভালোবাসি - রৌদ্রের যেন গন্ধ লেগে আছে । সুপনের', । 'বনলতাসেন'-এর 'ঘাস' কবিতায় কবি 'এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে গেলাসে পান' করার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। এই ইন্দ্রিয় সচেতনতা সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলেছেন 'সব কটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সেই শৈশব থেকে আমার নাকটা অতিমাত্রায় সজাগ সচেতন। পরবর্তী জীবনে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে এই গন্ধ আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।'[১] শৈশবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর ঠাকুরদার সঙ্গে প্রত্যহ প্রাতঃকালীন ভ্রমণে যেতেন। ঠাকুরদার সঙ্গে শহরের শেষ সীমায় রেললাইন পার হয়ে ধানক্ষেত, পাটক্ষেত দেখতে দেখতে খালের ধারে পৌঁছে যেতেন। পূর্ববাংলা হল নদীনালা খালবিলের দেশ, ভাদ্র মাসের জলে ডোবানো পাটের পচা গন্ধে, অঘ্রানের পাকা ধানের গন্ধে বর্ষার দিনে পুঁটি মৌরালা খলসে মাছের আঁশটে গন্ধে ভোরের বাতাস ভরে উঠতো। সেই সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রের মনও বিভোর হতো। এই ঠাকুরদার সঙ্গে তিনি হেলিডি সাহেবের বাংলোতে বেড়াতে যান, সেখানে তিনি দেখেন সদ্য ফোটা দুটো গোলাপ, ভোরের আলোয় ঝকঝক করছিল একটা সোনালি নীল প্রজাপতি একটা-আধফোটা কলির বোঁটায় চুপ করে বসে

আছে। বিস্ময়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অনুভব করেছিলেন ভাললাগা কাকে বলে, ভাল দৃষ্টি কী। সেই গোলাপে মৃদুগন্ধ তাঁকে এমন স্পর্শ করেছিল যা তাঁর কাছে এক আশ্চর্য সম্পদ বলে মনে হয়েছিল।

আগেই বলেছি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জীবনের একটা সময়ে রাজনৈতিক কারণে জেলে বন্দী হন, কিন্তু সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করেও তিনি 'সোনার বাংলা' 'বাংলার বাণী'তে বেশ কিছু গল্প লেখেন। মূলতঃ এই সময় থেকেই তিনি পর্যাপ্ত গল্প লিখতে শুরু করেন। সরকারি নিষেধাজ্ঞা তাঁর ওপর থেকে তুলে নেবার পরই, তিনি চাকরির সন্ধানে কলকাতায় চলে আসেন (১৯৩৭-৩৮)। প্রকৃতিপ্রেমী এই লেখকের চাকরি খোঁজার নেশার থেকে গল্প লেখার নেশাই অধিক পরিমানে ছিল। একটি হোটেলে সেই সময় থাকতেন এবং ছেলে পড়িয়ে যে কুড়ি-বাইশ টাকা রোজগার হতো তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। অধিক রোজগারের আশা তাঁর কোনদিনই ছিল না। সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' কাগজের সম্পাদক তখন ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বেঙ্গল ইমিউনিটিতে তিনমাস হিসাব দপ্তরে কাজ করার সময় প্রচার সচিব প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর পরিচয় হয় এবং ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁকে গল্প লেখাতে উৎসাহ দিতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর সম্পাদিত 'সংবাদ' এবং 'নবশক্তি'তে জ্যোতিরিন্দ্রের অনেক গল্প প্রকাশ করেন। সেই সময় 'পূর্বাশা' সাপ্তাহিক এবং 'অগ্রগতি' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় যেখানে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সাব-এডিটরের চাকরী পান এখানে তিনি মাত্র ন'মাস চাকরী করেন। যুগান্তরে চাকরী করা কালীন সময়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর তিনটি উল্লেখ-যোগ্য গল্প তিনটি পৃথক পত্রিকায় বের হয়। পূর্বাশায় 'সূর্য' ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় 'নদী ও নারী'(১৯৩৬) এবং 'দেশ' পত্রিকায়-'অনাবৃষ্টি'। 'যুগান্তর' পত্রিকায় কাজ করার পূর্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় টাটা এয়ার ক্রাফটের স্টোর ডিপার্ট-মেন্টে তিন বছর চাকরী করেন। এছাড়াও আংশিক ভাবে বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান জে-ওয়াল্টার

এ্যান্ড টমসন্-এ পাঁচ বছর যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য রচনার আকাঙ্ক্ষায় কোথাও তিনি স্থির ভাবে চাকরী করতে পারেননি। তিনি পাঠকদের মনোরঞ্জনের কথা ভেবে লিখতেন না, লেখার নেশাতেই সর্বদা মশগুল থাকতেন। লেখাটাকেই তিনি জীবিকা ভাবতেন। 'তাঁর শরীর ও মন এই দুটিরই সমান টান ছিল সাহিত্যের জন্য। জীবনের অন্য কোন দিকে তিনি কীর্তি স্থাপন করেননি, মনোযোগ দিয়ে সুষ্ঠুভাবে একটানা কোনো চাকরীও করতে পারেননি, তিনি শুধু সাহিত্য-রচনা করে গেছেন।'[২] 'যুগান্তর' পত্রিকায় কাজ করার পর 'আজাদ পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে তিন বছর যুক্ত ছিলেন। ইন্ডিয়ান জুট মিলস এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'মজদুর' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন এবং 'জনসেবক' পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এ সব চাকরী-ই ছিল স্বল্পকালীন এবং স্বল্প বেতনের, যা তাঁর দারিদ্র্য ঘোচাতে সক্ষম হয় নি। আর এই কারণে স্বচ্ছল জীবন বলতে যা বোঝায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তা কখনোই পান নি।

আত্মকেন্দ্রিক মানুষ বলতে যা বোঝায় জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন সে ধরণের মানুষ। অবান্তর কথা বলতে তিনি ভালবাসতেন না। 'সাহিত্য ঘটিত এবং জীবনযাপনের যে সব ব্যাপার সাহিত্যের সঙ্গেই জড়িয়ে যায় সেই সম্পর্কেই কথা বলতে ভালোবাসতেন।'[৩] তাঁর সাহিত্য কখনো পুরস্কার পাবে কিনা সে বিষয়ে কখনো চিন্তা ভাবনা করতেন না। যদিও তিনি আনন্দ পুরস্কার পেয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রকৃতিতে ছিলেন শিশুর মতো সরল। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে এই মানুষই, মানুষের মনের অত্যন্ত জটিল কামনা-বাসনা হিংসা ঘৃণার কথা লিখেছেন সুনিপুন ভাবে। তিনি ছিলেন একজন নিসর্গ প্রেমিক শিল্পী। পূর্ববাংলা থেকে কলকাতায় চলে আসার পর আজীবন সেখানেই ছিলেন, কিন্তু এই শহরের জনকোলাহল তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। তিনি নির্জন বারান্দায় বসে ঋতুবৈচিত্র্যের - রূপমাধুরী উপভোগ করতে ভালবাসতেন। ভালবাসতেন পাখিদের

কাকলি, উদ্ভিদের বিস্ময়কর বিকাশ। রৌদ্র, বর্ষা ও জ্যোৎস্নায় তিনি বিভোর হতেন। উন্মাদনা, উত্তেজনার চেয়ে মনঃসমীক্ষন ও বিশ্লেষণই তার গল্পে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি নিজেকে স্বেচ্ছা নির্বাসিত শিল্পীতে পরিণত করেছিলেন। কলকাতার উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়েও পাঠক মহলে অসাধারন্য জনপ্রিয়তা কখনোই অর্জন করতে পারেননি।

জ্যোতিরিন্দ্র যেমন নিসর্গের নির্জনতা উপভোগ করতেন, সেরকম বই পড়তে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। দেশি বিদেশী সবরকম সাহিত্যই পাঠ করতেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আধুনিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি কী হচ্ছে সেটা জানার জন্য প্রচুর বিদেশী বই পড়তেন। আবার সমানভাবেই বাংলা সাহিত্যের বয়ঃকনিষ্ঠ লেখকদের লেখা অত্যন্ত মন-যোগ সহকারে পড়তেন। নতুনকালের নতুন লেখকদের স্পন্দনকে তিনি স্পর্শ করতে চাইতেন। মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বছর তিনি কাফ্কার প্রচুর রচনা পড়েছিলেন, আর সেজন্যই হয়তো শেষ জীবনের লেখাতে বিমূর্ত ভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। এছাড়াও স্টেইনবেকের চেতনার সঙ্গে তার মানসিক সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়। স্টেইনবেকের 'প্যাশ্চার্স অফ হেভেন' দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তার 'সূর্যমুখী' উপন্যাসে এর কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমারসেট মম-এর 'রেন' ও 'রেড' পড়ে তিনি তৃপ্ত হতেন। হেমিংওয়ের 'মেন উইদাউট উইমেন' বইটির প্রতিও তার অত্যন্ত আকর্ষণ ছিল, সেই সঙ্গে এইচ·ই·বেটস-এর গল্প তাঁর প্রিয় ছিল। তবে স্টেইন-বেকের রচনায় কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা অবাধ যৌন আবেগ- ইত্যাদির সমাবেশ দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও এই কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, যৌন আবেগ দেখা যায়, কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে তার রচনায় কোথায় যেন একটা সৌন্দর্য নির্জনতা, নিসঙ্গতাকে উপলব্ধি করা যায়, যা একেবারে মৌলিক, যা এইসব বিদেশী লেখকের গল্পে একেবারেই দুর্লভ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অনেক সময় গল্প রচনার পূর্বেই সেই গল্পের বর্ণনা করতেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন এই ভাবে -

> তার পর বুঝলে, দুবন্ধু গেল পুরীতে ... একটা বাসা ভাড়া করে রইলো, বুঝলে রাত্রে মেয়েটা বুঝলে তারপর মেয়েটা তো খুন হয়ে গেল বুঝলে, তখন পাশের ঝাউবনে সাঁ সাঁ করে হাওয়া দিচ্ছে, সাঁ সাঁ করে হাওয়া দিচ্ছে, বালির মধ্যে ঝাউ গাছগুলোর পাতায়। মেয়েটার খুন হওয়ার ব্যাপারে তিনি সামান্য গুরুত্বও দিলেন না, কিন্তু পাশের ঝাউ বনের সাঁ সাঁ ঝড়ের বর্ণনায় তার অদ্ভুত উত্তেজনা দেখা গেল, উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে তিনি ঝড়ের আন্দোলন বোঝাতে লাগলেন। তার চোখ মুখ তখন একেবারে পাল্টে গেছে, যেন তিনিই সেই ঝড়ের মধ্যে পড়েছেন। [৪]

পূর্ববঙ্গ থেকে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় আসার পর আর কখনো কুমিল্লায় ফেরেন নি। কলকাতার এক মেসের ক্ষুদ্র পরিসরে দীর্ঘদিন বাস করেছেন। এর পর স্থান বদলও করেছেন কয়েকবার। কলকাতায় কখনো তিনি বেলেঘাটার বস্তি কখনো বাগমারিরোডের ভাড়াবাড়িতে দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। আবার শেষ জীবন তিনতলার সরকারী ফ্ল্যাটের ক্ষুদ্র পরিসরেও দিন কাটিয়েছেন। সর্বত্রই তাঁর সঙ্গী ছিল নির্জনতা, অন্তর্মুখতা। তিনি কথা বলার চেয়ে চুপ করে থাকতেই বেশী ভালবাসতেন। রাজনৈতিক কোলাহল তাকে আকর্ষণ করতো না, বরং বৃষ্টির শব্দ শুনতে তিনি অধিক আকর্ষণ বোধ করতেন। কলকাতায় সুদীর্ঘকাল বাস করেও এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখার জন্য তার কোনরকম আগ্রহ ছিলনা। সারাজীবনে তিনি পুরী,

দীঘা, কাশী গয়া শিমুলতলা ও ঘাটশীলায় ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু তার ধারনা ছিল দেশভ্রমণ না করলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় না। এবং গল্প উপন্যাস রচনার জন্য এই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে সেটা তিনি বিশ্বাস করতেন। এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেছেন - একটি ছোট সংবাদপত্র অফিসে (জনসেবক) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে সুনীল গাঙ্গুলী কাজ করতেন কিছুদিন। সেখানে কমলকুমার মজুমদার মাঝে মাঝে আসতেন। এখানে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে কমলকুমারের সাক্ষাৎ ঘটে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন -

> ... ওদের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল ওঁরা কেউই কারুর কোনো লেখা পড়েননি। ... যেমন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বললেন - বুঝলেন কমলবাবু লেখার জন্য অনেক অভিজ্ঞতার দরকার অনেক দেশ ও মানুষ দেখা দরকার বুঝলেন, অনেক জায়গায় যাওয়া দরকার বুঝলেন, এমনি এমনি কি হয় ? কমলকুমার মজুমদার গম্ভীরভাবে বললেন আমার কিন্তু তা মনে হয় না, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু অভিজ্ঞতার জন্য তো ঘোরাঘুরির কোনো দরকার নেই। সমস্ত অভিজ্ঞতাই পাওয়া যায় গ্রন্থের মধ্যে মানুষের মনীষার যা কিছু সবই তো গ্রন্থের মধ্যে আছে, অভিজ্ঞতার জন্য বাইরে তাকাবার কোনো মানে হয় না। অথচ লক্ষ্য করার বিষয় হল কমলকুমার সেই সময় ছিলেন ডাকাবুকো ধাতের অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষ আর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন লাজুক স্বভাবের ঘরকুনো একা চোরা ধরনের মানুষ।[৫]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জীবনের একটা সময়ে বেলেঘাটা, ট্যাংরা ইত্যাদির বস্তি অঞ্চলেও দারিদ্রের মধ্যে কাটিয়েছেন। যা তিনি বাস্তবরূপ দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে

'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে (১৯৫৫)। বস্তিজীবনের পটভূমিতে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' উপন্যাস এক সময় পাঠক মহলে চমক সৃষ্টি করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্র সে ধরনের চমক সৃষ্টি করেননি, কিন্তু চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত মানুষের অবক্ষয়ের এক প্রামাণ্য দলিল হয়ে রয়েছে এই উপন্যাস। বস্তিজীবনে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তারই প্রেক্ষিতে একটা সময়কে তিনি ধরতে চেয়েছিলেন - যে সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দিশেহারা, পারিবারিক জীবনে তারা মেনে নিচ্ছে সব অন্যায়কে। মানুষ এই সময়ে অর্থনৈতিক নিয়ম নিয়তি শাসিত হয়ে ভেসে যেতে বাধ্য হচ্ছিল এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে। 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই অন্ধকারে নির্মোহ এক চিত্রকর।'[৬] মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের চিত্র আঁকতে গিয়েই জ্যোতিরিন্দ্র সার্থক শিল্পী হয়ে উঠেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন -

> আমি তো মধ্যবিত্ত মানুষ, কাজেই এই জীবনের সঙ্গে যতটা পরিচয় অন্য জীবনের সঙ্গে আমার ততটা পরিচয় নেই। কাজেই এখানে আমি যতটা দেখতে পাই শুনতে পাই ততটা অন্যজীবনে নয়। আর এটা তো ডেকাডেন্স, অবক্ষয়েরই যুগ।[৭]

এই অবক্ষয়ের চিত্র তার উপন্যাস ও গল্পে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু একমাত্র অবক্ষয়কেই তিনি অবলম্বন করেন নি। বিভিন্ন বিষয়কেই তিনি তার গল্প রচনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। এক সময় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখায় মর্বিডিটির অভিযোগ ছিল, যদিও তিনি তার কোন গল্পের বিরূপ সমালোচনায় উত্তেজিত হতেন না, কিন্তু মনে মনে হয়তো আহত হতেন। তাঁর 'সোনার চাঁদ' গল্প সম্পর্কে পাঠক মহলে এক ধরণের সমালোচনার ঝড় উঠেছিল কিন্তু এ সবে তিনি উত্তেজিত না হয়ে মুখে চাপা হাসি এনে বলতেন -

> ... তবেই, বুঝে দেখুন ব্যাপার। ধেৎ। ছাড়ুন ওদের কথা, যা খেয়াল হয় লিখি। আবার কখনো দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন - বই যদি সে রকম বিক্রি না হয় তাহলে লেখার তেজও কমে যায়।[৮]

শেষ জীবনে তিনি তিনজলা সরকারী ছোট ফ্ল্যাট বাড়িতেই কাটিয়েছেন তার স্ত্রী পারুলনন্দী ও পুত্র তীর্থঙ্কর নন্দীর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রী পারুল নন্দী সেতার বাজাতেন, এটা তাঁর পুত্রের কাছ থেকেই জানা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গৃহেও একেবারেই নিরাভরণ ভাবে জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত ঘরে থাকতো 'একটি বুক শেলফ্ ছোট একটি টেবিল চেয়ার, ইতস্তত: ছড়ানো কিছু পত্র পত্রিকা।'[৯] সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় একজন লেখক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন 'একটি বুক-শেলফ্ ছাড়া একজন লেখকের ঘরে আর কোন সম্পদ থাকতে পারে না।' বাস্তবিক জ্যোতিরিন্দ্র একজন প্রকৃত লেখকের মতো জীবন কাটাতেন। তাঁর ৬৭ বছর বয়সেও ভাবতেন কী করে আরও আরও একটা ভালো গল্প লেখা যায়। সারা জীবন ধরে তিনি অর্থ নয়, কীর্তি নয়, শুধু ভেবেছেন সাহিত্যের কথা, সাহিত্যের উপজীব্য মানুষের কথা। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এটা প্রচারের যুগ, যে প্রচার তাকে নিয়ে হয় নি। কিন্তু তিনি প্রচারে প্রত্যাশী ছিলেন না। তাঁর মতো দু-একজন পাঠকও যদি তার লেখাকে সার্থক বলে মনে করে, সেখানেই তিনি সন্তুষ্ট। তাঁর লেখা যে বাজারে কাটতি নেই সেটা তিনি জানতেন। এই জনপ্রিয় না হওয়া প্রসঙ্গে তিনি সেভাবে কোন ব্যাখ্যাও খুঁজে পাবার চেষ্টা করেননি। কারণ তিনি ছিলেন প্রকৃতই একজন শিল্পী। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে তিনি পেটের গোলমাল সারাতে কোনো একটি এ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছিলেন যার ফলে তার চোখের জ্যোতি ক্রমশই নিবে আসছিল।[১০] কিন্তু তখনও অনেকগুলি গল্পের প্লট তার মাথায় ছিল।

তিনি ভেবেছিলেন টেপ রেকর্ডারের সাহায্য নিয়ে সেই সব গল্পের কাজ শেষ করবেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জীবন কাটিয়েছেন নিরাভরণ ভাবে, দুঃখ, দারিদ্র্য তাকে পরিত্যাগ করেনি, এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনেকটাই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, মৃত্যুর সময়েও তিনি পৃথিবীর মায়াকে অতিক্রম করেছেন একেবারেই নিরাভরণ ভাবে। মৃত্যুর সময় বা তার অন্তিম সংস্কারের সময় হাতে গোনা ক-জন মানুষ ছাড়া বিশেষ কেইই ছিলেন না, অত্যন্ত সাধারণভাবেই তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।'[১১] আধুনিক কালের কবি সুব্রতরুদ্র এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন তার একটি কবিতায় - কবিতার নাম 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যখন যাচ্ছেন' নিচে তা উল্লেখ করা হল -

স্রেফ একদম একা
সৎকার সমিতির গাড়ি চড়ে বাক্সবন্দী
পৌঁছলে কেওড়াতলায়,
মুখে আগুন পেলে, একটা ফুলের মালা পর্যন্ত না
কেউ আসে নি, তোমার কোনো
বন্ধু তোমায় দেখতে এলো না
খাঁ খাঁ করছে শ্মশান
এই তার পুরস্কার।[১২]

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোট গল্প
(১৯৩৬ - ১৯৮২)

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলা হয় প্রকৃতির লেখক। কিন্তু তার অনেকটা পরবর্তীকালের লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সম্পর্কে বলা হয় না। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যেও রয়েছে এক বিশিষ্ট প্রকৃতি চেতনা। যা তিনি তার গল্পগুলির মধ্যেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর যে সব গল্পগুলি তাঁকে 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী' হিসেবেই পাঠকমহলে পরিচিত করিয়ে দেয় সেগুলি সবই প্রকৃতি নির্ভর যেমন 'বনের রাজা'(১৯৫৯) 'শিরশিটি' - 'সামনে চামেলি' ইত্যাদি গল্প। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলিকে সময়ের দিক দিয়ে তিনটি পর্বে বিভাজন করা যেতে পারে প্রথম পর্ব হলো ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ 'সূর্যমুখী' তার প্রথম উপন্যাস লেখার সময় পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্ব ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ খৃষ্টাব্দ - এ সময়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক ঘটনা ঘটেছে। তৃতীয় বা শেষ পর্ব ১৯৭২ থেকে ১৯৮২ অর্থাৎ তার মৃত্যু পর্যন্ত। বিভূতি-ভূষণের প্রকৃতির বর্ণনায় রয়েছে শিশুর মুগ্ধতা। জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যে এই শিশুর মুগ্ধতা না থাকলেও শহরের জীবনে আমাদের আশে পাশে যে প্রকৃতি যেমন একটা ছোট জঙ্গল বা নিরালা পুকুর অথবা কুয়োতলার সবুজ-শ্যাওলা আর আগাছা - তাদের গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ নিয়ে সজীব হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় তিনি ক্ষান্ত হননি। প্রকৃতির মধ্যে এসে কখনো কখনো আপাত নিরীহ মানুষের মনেও হত্যার ইচ্ছে জাগতে পারে, মানুষের আদিম প্রকৃতি মাথা চারা দিয়ে উঠতে পারে, মানুষ হয়ে উঠতে পারে ভয়ংকর - তাকেও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন গল্পের মধ্যে।

প্রথম পর্ব (১৯৩০-১৯৪৮)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম গল্প বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত ১৯৩০ সালে। কিন্তু ১৯৩৬ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় 'নদী ও নারী' গল্পটি প্রকাশিত হলে পাঠক মহলে আলোড়ন

সৃষ্টি হয়। আবার তাঁর প্রথম উপন্যাস হলো 'সূর্যমুখী'(১৯৪৮)। এই উপন্যাস লেখায় হাত দেবার আগে তিনি অনেক গল্প লিখেছেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'পালিশ', 'মঙ্গলগ্রহ', 'কমরেড', 'বধিরা', 'শালিক কি চড়ুই', 'শশাঙ্ক মল্লিকের নতুন বাড়ি', 'বনানীর প্রেম', রাইচরণের বাবরি' ইত্যাদি। তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রকৃতি ও নারী পরস্পরের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিয়ে উঠে এসেছে। এই নারীকে প্রকৃতির মধ্যে রেখে তার মন বিশ্লেষণ করেছেন 'নদী ও নারী' গল্পে। এই গল্পের নায়িকা আধুনিকা তরুণী, হলুদ - ছোপ দেওয়া শাড়িতে সে যেন সত্যিই একটা চিতা বাঘিনী। পদ্মার চরে বেড়াতে গিয়ে সুরপতি-নির্মলা এই রহস্যময়ী নারীকে এক দেহোজীবীনী ভেবে নেয়। কিন্তু নিজেদের কৌতূহলের বসেই অবশেষে তারা জানতে পারে এই নারী তার রোগগ্রস্থ, বিকলাঙ্গ স্বামীকে নিয়ে চিকিৎসকের নির্দেশে বছরের পর বছর নদী-বক্ষে দিনযাপন করছে প্রাচীনকালের বেহুলার মতো। নদী যেমন যাবতীয় আবর্জনাকে নিয়ে নিজের গতিতে বয়ে চলে, এই নারীও জীবনের যাবতীয় দুঃখকে নিয়ে চলেছে অনির্দেশের দিকে।

আবার মানুষের নিজস্ব দেহগত সৌন্দর্য নিয়ে মনোবিশ্লেষণ দেখা যায় 'রাইচরণের বাবরি'(১৯৩৬-দেশ, তৃতীয় সংখ্যা) গল্পে। এই গল্পে দেখা যায় রাই-চরণ তার মাথার কুঞ্চিত কালো কেশ রাশিকে জীবনের যে কোন বস্তু বা বিষয় থেকে অধিক গুরুত্ব দেয়। এই কেশরাশির বিচিত্র বর্ণনা গল্পটির মূল লক্ষ্যকে সার্থক করে তুলতে সহায়তা করেছে। অবশেষে যাত্রাদলে রাইচরণ ডাকাতের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পায় তার এই কেশরাশির জন্যই উপযুক্ত পারিশ্রমীকে, কিন্তু দর্শকেরা তার এই অতি যত্নের পরম আদরের কেশরাশিকে যদি নকল বলে ভাবে এই চিন্তায় সে যাত্রার দলের চাকুরী ত্যাগ করে। নিজ দেহের বিশেষ অংশের সৌন্দর্য সম্পর্কে এই

যমতা, অনুভূতি বা বলা যায় এক ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীনতা গল্পটিকে অন্য যাত্রা দিয়েছে। সৌন্দর্য যে নির্দিষ্ট কোন বস্তু বিশেষের মধ্যে নেই তা রয়ে যায় দেখার চোখে সেটা এই গল্পেই লেখক বুঝিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রের এই পর্বের গল্পে ইঙ্গিতময়তা, মানুষের মনের সূক্ষ্ম গভীর অনুভূতি নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যেমন 'শালিক কি চড়ুই' গল্পে দেখা যায় হীনমন্যতাবোধে জর্জর এক নিম্নবিত্ত মানুষকে। এ গল্পকে যদি এক দরিদ্র কেরাণীর সৈরিনী স্ত্রীর নিছক যথ্যাহ্ন-রতি বিলাসের গল্প বলে ভাবা হয় তবে সেটা ভুল হবে। প্রকৃত পক্ষে লেখক নিঃশব্দে সমাজের যে অবক্ষয় ঘটছে, সে দিকটিকেই উন্মোচিত করেছেন। বিত্তবান পাত্রে কন্যাকে দিয়ে তার করুণ পরিণতি সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়েই মেয়ের বাবা মেয়েকে সৎ কর্মঠ, দরিদ্র অথচ উদার কেরাণীর হাতে সমর্পণ করে। এই কেরানী নিজের উদার দৃষ্টি-ভঙ্গীতেই তার স্ত্রীকে সরল নিষ্পাপ মনে করতো সে ভাবত এই স্ত্রীর নিঃসঙ্গ দুপুর কাটে চৌবাচ্চার ধারে এটো ভাত খেতে আসা চড়ুইদের সঙ্গে। কিন্তু একদিন সে আবিষ্কার করে মানুষরূপী শালিকের অর্থাৎ পল্লবসেনের আনাগোনা ঘটছে তার গৃহে তার অনুপস্থিতিতে। সে বোঝে পদ্ম-পুকুর রোডের মেয়েদের রঙ বদলায় কিন্তু রক্ত বদলায় না। আর তাই এই দরদ্রি কেরানী অসহায় ভাবে শ্লেষের সুরে বলে 'কে জানে কাল আবার কি আসে, শালিক না চড়ুই'। একটা তীব্র তিক্ততায় বুকের জ্বালা নিয়ে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এই গরীব কেরানী। এ রকমই আর এক হত দরিদ্র কেরানীকে দেখতে পাওয়া যায় 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পে। 'বারোঘর এক উঠোন' সম্পর্কে পাঠকদের একটা অনুযোগ উঠেছিল, উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্র লিখেছিলেন -

> আলো দেখাবার জন্য উত্তরন দেখাবার জন্য আমি এ বই লিখিনি। বিপথ-বিপর্যস্ত অবক্ষয়িত সমাজের মানুষগুলি শুধু বেঁচে থাকার জন্য, কোনো রকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কতটা অন্ধকারে, কতটা নিচে নেমে নেমে যেতে পারে আমি তাই দেখিয়েছি।[১৩]

তার এই মন্তব্য তার গল্পগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মঙ্গলগ্রহ আমাদের কাছে লালরঙের রহস্যময় এক অচেনা জগৎ অথচ তা মানুষকে প্রতিনিয়তই আকর্ষণ করছে। এ গল্পেও রয়েছে দরিদ্র এক প্রৌঢ় কেরানী, যে তার প্রতিবেশিনী উচ্চবিত্ত সুন্দরী রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। মঙ্গলগ্রহের লাল রঙের আলোর মতো এই রমণীর ঘরটিও দরিদ্র প্রৌঢ় কেরানীর কাছে রঙিন, রহস্যময় মনে হয়। এই প্রৌঢ় কেরানী জীবন থেকে পেয়েছে শুধু রোগগ্রস্থ পঙ্গুস্ত্রী চরম দারিদ্র্য আর অপ্রয়োজনীয় সন্তান। কিন্তু উচ্চবিত্ত এই রমনী তার ইঞ্জিনীয়র স্বামীর প্রচ্ছন্ন সমর্থনে নিজ যৌবনের মরীচিকা দেখিয়ে সংসারের বিভিন্ন কাজ করিয়ে নেয় বিনা পারিশ্রমীকে। গল্পের শেষে দেখা যায় এই দরিদ্র কেরানী নিজের স্থান এই উচ্চবিত্ত রমনীর কাছে কোন স্তরে সেটা অনুভব করে, আর এক দুর্বিসহ লজ্জা, ঘৃণা জন্মে তার নিজের ওপরেই। একটা তীব্র শ্লেষ জড়িয়ে আছে সমস্ত গল্পটিকে ঘিরে। এ গল্প শুধুমাত্র লাল আলোর যৌন-সংকেতে তথাকথিত এক শিক্ষিতা রমনীর আকর্ষণে প্রৌঢ় এক পুরুষের ঝিমন্ত লিবিডো জেগে ওঠার গল্প নয়। এ-ও এক অবক্ষয়েরই গল্প। এ গল্পে নির্দিষ্ট কোন সময়ের উল্লেখ নেই। গল্পের পুরো মাধুর্য ধরা হয়েছে এর সমাপ্তিতে।

এই পর্বের অন্যতম গল্প হল 'পালিশ'(পূর্বাশা পত্রিকা)। জ্যোতিরিন্দ্র তার গল্পে কখনো কোন প্রতিবাদের উচ্চারণ তোলেন নি এবং এ প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন তার সৃষ্ট 'লোকগুলোই কোন প্রতিবাদ করেনা ওরা শুধু মেনে নেয়। চরিত্রগুলোকে নিখুঁত ও জীবন্ত করার জন্যই প্রতিবাদের আওয়াজ তুলিনি।' সমাজের শোষণ, দুর্নীতি, অত্যাচারে, অধঃপতনকে তিনি তাঁর গল্পে দেখিয়েছেন। 'পালিশ' গল্পটিতে রয়েছে জুতো পালিশ করার একটি ছেলের গল্প। আবার বেকার ছেলেদের নিয়ে লিখেছেন 'লাইনের ধারে' গল্প, যারা চুরি, ছিনতাই করেই জীবন

চালায়, এর মধ্যে দিয়েই বেঁচে থাকে। 'পালিশ'(পূর্বাশা) গল্পে দেখা যায় শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠছে। সারাদিন জুতো পালিশ করে যার দিন চলে সেই কিশোর মন্নু উত্তেজনায় বলে 'লাল ঝান্ডা উঁচু রাখব, বস্তি ছাড়ব না।' - এ গল্পটি জ্যোতিরিন্দ্রের ১৯৩০ থেকে ১৯৪৮এর মধ্যে লেখা। এই সময় রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য কমিউনিস্ট আন্দোলন জোড়দার হয়ে উঠছে। কিন্তু গল্পে একটা প্রতিবাদের সম্ভাবনা থাকলেও সেটাই গল্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে ওঠে নি। লেখক দেখিয়েছেন সমাজের এই সব মানুষেরা কুকুরের পাশে শুয়েই রাত কাটায়। ঘর থাকলেও তা এই কিশোরকে ক্লান্তির সময় - হাতছানি দিয়ে ডাকে না। একটা তিক্ত শ্লেষ, তিক্ত অভিমান নিয়ে এরা বেঁচে থাকে। লেখক তার ক্যামেরার লেন্সকে জুম্ করেছেন কিশোরটির মনের ভেতরে। তাই দেখা যায় গল্পে সব প্রতিবাদ ছাপিয়েও বড় হয়ে ওঠে তার মনের দিকটি। সে ক্রমশ আর কোন সভার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে না। নিম্নজীবনযাত্রায় আবার সে মনযোগ সহকারে পালিশের কাজ করে এবং তার মনের যে আকাঙ্খা সেটা হল 'বাঙালি জেনানা খুপ সুরুত।' 'আমি বাঙালনি শাদি করব।' এই কিশোরটির মা'ও ছিল বাঙালী কিন্তু সেই মা অধিক সুখের জন্য এই শিশুপুত্রকে ফেলে রেখে করিম মিঞার সঙ্গে চলে যায়। তার বাবাও তার বাঙালী মায়ের রূপ দেখেই বিয়ে করেছিল। অর্থাৎ শিশুকাল থেকেই এই ছেলেটি বঞ্চনার মধ্যে বড় হয়ে ওঠে, পরিবারের অত্যন্ত নিকট জনের কাছ থেকে সে কিছু পায় না, তাই সমাজের কাছ থেকেও কিছু পাবার আর প্রত্যাশা সে করে না। এই ছেলেটি তার বাবা মায়ের স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। একটা বিশেষ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেই সম্পর্কগুলো দাঁড়িয়ে থাকে অসহায়তা নিয়ে। জ্যোতিরিন্দ্র কোন প্রতিবাদ নয় মানুষের এই অসহায়তার কথাই বলতে চেয়েছেন। তার পূর্বসূরী প্রেমেন্দ্রমিত্রের 'মহানগর' 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' ইত্যাদি গল্পেও এ

অসহায়তা দেখা যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের ভাষার মধ্যে বিভিন্নভাবে শ্লেষের প্রয়োগ দেখা যায়। ধীমান দাশগুপ্ত বলেছিলেন যে তাঁর গল্পে যেগুলি প্যাশন বলে মনে হয় সেখানেও আসলে শ্লেষই বেশি। 'বর্ণনায় সংলাপেও উপমা নির্বাচনে এই শ্লেষ তার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।'[১৪] এই শ্লেষই চিনিয়ে দেয় লেখক হিসেবে তাঁর সমর্থন কোন্ দিকে। মানুষের চিরন্তন জৈবতায় তার শুধু সমর্থন নয়, সমর্থন রয়েছে জৈবতার দিকে নিক্ষিপ্ত চিরন্তন তিরস্কারে।

দ্বিতীয় পর্ব (১৯৫০-১৯৭১)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রকৃতি চেতনা যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমন ভাবে আবার স্বাধীনতা উত্তরকালে বাঙালী জীবনে যে বিভিন্ন সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠছিল তারও সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু লেখক কখনোই সেই সব সমস্যা সমাধান বিষয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেননি। এই সব সংকটময় অবস্থায় মানুষেরা কেমন ভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবস্থান করছে সেটাই দেখাতে চেয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনন্দীর প্রথম পর্যায়ের গল্পের রেশ এই দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়ে গেছে। তার পূর্ববর্তী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ - এঁদের গল্পেও মানুষের এই সংকটময় জীবনের কথা রয়েছে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই পর্বের কিছু গল্পে, মানুষেরা এই সংকটময় অবস্থা থেকে একটা অন্য যাত্রা পেয়ে যায়। অর্থাৎ সংকটের কথা থাকলেও জ্যোতিরিন্দ্রের নিজস্ব যে বৈশিষ্ট্য - প্রকৃতির রূপ, সৌন্দর্য বর্ণনা, চিত্ররূপময়তা ইত্যাদি গল্পগুলোতে রয়ে যায়। এই পর্যায়ের অন্যতম গল্প হল 'জ্বালা'(১৯৫৮)। এ গল্পের শুরু হয়েছে এমন একটা প্রাকৃতিক বর্ণনা দিয়ে যা পাঠক মনেও জ্যৈষ্ঠের দাবদাহের স্পর্শ এনে দেয়। এই বর্ণনার মধ্যে দিয়েই লেখক গল্পের একটা ভয়ংকর জ্বালাধরা পরিস্থিতিকে আগাম

ঘোষণা করে দেন। নীরার মনে শুধু প্রকৃতিই জ্বালা ধরায় না, এক ভয়ংকর মানুষও নীরার মনে দাবদাহ সৃষ্টি করে, কারণ এই শানওয়ালা তার দৃষ্টিতে যেমন আগুন ধরায় তেমনি তাকে ভয়ংকর করে তোলে তার বিকট অস্ত্র, ধারাল যন্ত্রপাতি। এই মানুষটি নীরার কাছে আরো ভয়ংকর আরো আতঙ্কের হয়ে ওঠে যখন জানা যায় যে - অভাবের তাড়নায় সে তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে, এবং এই হত্যার জ্বালা বুকে নিয়ে সে অস্ত্র শান দেওয়াকে জীবিকা করে পথে বের হয়েছে। অভাবের রূঢ় বাস্তব ছবি এখানে রয়েছে, কিন্তু সব ছাপিয়ে নীরার মনের বিদ্বেষজাত জ্বালা, শানওয়ালার মনের হত্যার জ্বালা, জ্যৈষ্ঠের দুপুরের জ্বালা ধরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই গল্পের আদি এবং অন্তে রয়েছে দুটি নারী-পুরুষের মনের জ্বালা ধরা অনুভূতি। এই অনুভূতিকে লেখক স্থাপন করেছেন জ্বালাধরা জ্যৈষ্ঠের দুপুরের প্রাকৃতিক পটভূমিতে। এ গল্পেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর যে বৈশিষ্ট্য চিত্ররূপময়তা, সেটা লক্ষ্য করা যায় যেমন -

> ... কেউ তাকায়, দেখবে ঝড়ের বাড়ি খাওয়া পুরনো একটা
> শ্যাওড়া গাছের সামনে একটা টগর ফুলের কুড়ি দাঁড়িয়ে আছে,
> কুড়ির পিছনে এত বড় একটা লাল টগর।

অথবা,

> জ্যৈষ্ঠ দুপুরের প্রতপ্ত আকাশের নিচে দাঁড়ানো ঐ পুরানো
> জীর্ণ গাছ আর দুটি তাজা ফুল ...

এখানে শানওয়ালা মানুষটির সামনে ছোট পিন্টুরানী ও তার মা'র দাড়িয়ে থাকাকে লেখক অপূর্ব ভাষা কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন। লক্ষ্যনীয় বিষয় এক্ষেত্রে লেখক মানুষকে পরিচিত করছেন গাছ, ফুল ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে। শানওয়ালা পাঠক মনে দৃশ্যায়িত হচ্ছে 'ঝড়ের বাড়ি খাওয়া পুরনো একটা শ্যাওড়া গাছ' দিয়ে। জ্যোতিরিন্দ্র

এই মানুষটির ছবি পাঠক মনে গেঁথে দেবার জন্য গল্পের একই পরিচ্ছেদে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করেছেন 'জ্যেষ্ঠ দুপুরের প্রতপ্ত আকাশের নিচে দাঁড়ানো ঐ পুরানো জীর্ণ গাছ'। এ গল্পে পুরানো জীর্ণ গাছ আর শানওয়ালা মিলে একাকার হয়ে গেছে। এ গল্পে রয়েছে একটি মাত্র দুপুরের ঘটনা, যেখানে খুব সংক্ষেপেই লেখক জানিয়ে দেন মানুষের স্বভাবের অসহায়তার কথা।

জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে বিত্তহীন মানুষেরা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ভাবে। এই পর্বের অন্যতম গল্প 'তারিনীর বাড়ি বদল' - গল্পে নিঃস্ব রিক্ত এক মানুষের দেখা মেলে। এ গল্পের তারিনী কলকাতা শহরের বস্তিবাসী মানুষেরই প্রতিনিধি। এই তারিনী সমস্ত রকম অভাব ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ অপমানকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে শুধু বাঁচতে চেয়েছিল, আর এই বাঁচার প্রচেষ্টাতেই শেষ বারের মতো জ্বলে উঠতে গিয়ে, নিভে গেল চিরদিনের মতো। এ মৃত্যু কোন মহান মৃত্যু নয়, এক এ সর্বগ্রাসী রিক্ততা জড়িয়ে আছে, যার সঙ্গে লেখকের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। লেখক এ গল্প সম্পর্কে বলেছেন 'পূর্বাশায় তারিনীর বাড়ি বদল' বলে আমার একটা গল্প বেরোয়। আমি চিন্তা করে দেখেছি 'বার ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের বীজ কয়েক বছর আগে লেখা ঐ গল্পের মধ্যে লুকিয়ে ছিল।'[১৫] ১৯৫৫তে 'বারো ঘর এক উঠান' লেখা হয়, কাজেই ১৯৫৫-র কিছু আগেই 'তারিনীর বাড়ি বদল' গল্পটি লেখা হয়। একই রকম অভাব অনটনের গল্প এই পর্বের 'বুটকি ছুটকি'(১৯৫২)। এই গল্পটি প্রসঙ্গে লেখক তার ঘ্রানেন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন - যে, তাদের বাসার কাছেই ছিল ভুবন পন্ডিতের বাসা। সেই বাসায় রান্নাঘরের পিছনে বাতাবি লেবুর লোভে যখন যেতেন তখন পন্ডিতের দুই মেয়ে বড়বুড়ি ও যমুনার গায়ে পেতেন বাদ্‌লা দিনে মাটির খোলায় কাঁঠাল বিচি ভাজার গন্ধ। কৈশোরের সেই গন্ধের স্মৃতি তাকে দিয়ে চল্লিশ বছর বয়সে 'বুটকি ছুটকি' গল্প লিখিয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে অভাব অনটন, অসহায়তাকে ছাপিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে প্রায় সর্বত্রই প্রকৃতি। এই পর্বের অন্য গল্পগুলির থেকে কিছুটা ভিন্ন জাতের গল্প হলো 'বনের রাজা'(১৯৫৯)। এই গল্প সম্পূর্ণ রূপেই প্রকৃতি নির্ভর। এখানে প্রকৃতি তার রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই গল্পের মধ্যে লেখকের শৈশবের স্মৃতিকেও ধরা যায়। লেখককে দিয়ে কৈশোরের গন্ধের স্মৃতি যেমন করে 'বুটকি ছুটকি' গল্প লিখিয়েছিল। শৈশবের তার নিত্যসঙ্গী দীর্ঘায়ু ঠাকুরদার গায়ের পাকা আমের গন্ধ, ফুলের গন্ধ তাকে দিয়ে 'বনের রাজা' গল্প লিখিয়েছিল। এ গল্পে প্রকৃতির থেকে . . . সরাসরি রস আস্বাদন করছে ষাট বছর বয়সের দাদু সারদা, কিন্তু তার দৃশ্য দেখছে এবং উপভোগ করছে ছোট্ট দশ বছরের নাতি যতি। এই যতির চোখ দিয়েই লেখক প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকা মানুষ আর কৃত্রিম শহরকেন্দ্রিক মানুষের জীবনের তুলনা করেছেন। ক্রমশ এই বৃদ্ধ মানুষটি প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতে প্রকৃতির সামনে উলঙ্গ হয়ে যায়, এই নগ্নতা যতির ভাল লাগে। পুকুর থেকে উঠে আসা সদ্যস্নাত দাদুকে তার বহু প্রাচীন গাছ বলে মনে হয়, যার গায়ে যতি পায় শাপলাফুলের মিষ্টি মদির গন্ধ। এখানেও প্রকৃতি আর মানুষ সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের ঔপন্যাসিক ডি•এইচ•লরেন্স নগ্নতা, যৌনতা সম্পর্কে প্রাচীনপন্থীদের ধারনাকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করেছেন, এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার 'Sons and Lovers' উপন্যাসে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও লরেন্সের মতো নরনারীর শরীর, নগ্নতা, যৌনতা বিষয়ে সমস্ত রকম জড়তাকে কাটিয়ে উঠেছিলেন।

এ পর্বের গল্পে দেখা যায় মানুষ কখনো কখনো তার ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তে, প্রাকৃতিক সত্তা লাভ করছে যেমন 'বনের রাজা' গল্পের সারদা যতির কাছে 'গাছ' হয়ে যায়। আবার প্রকৃতি পার্সোনিফায়েড হয়েছে কোন কোন গল্পে, যেমন 'বৃষ্টির পরে'

অথবা 'গাছ' ইত্যাদি গল্পে। 'গাছ' গল্পে লেখক প্রতীকী ব্যবহারে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ গল্পে 'গাছ'কে জ্যোতিরিন্দ নন্দী একটি বিশেষ মাত্রায় নিয়ে গেছেন। এবং গল্পের শেষে দেখা যায় - 'গাছ চোখ বুঝল, তার ঘুম পেয়েছে, গাছও ঘুমায়, কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমাতে পারেনি। ... গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না।'[১৬] আবার এই প্রকৃতিই ইন্দ্রিয়জ তৃপ্তি দিয়েছে 'শিরশিটি' গল্পে মায়াকে, 'সেখানে কুয়োতলার নির্জনতা ও নৈঃশব্দ যেন হয়ে উঠেছে দেহের আরাম। আর সেখানে আছে এক প্রতিবেশী বৃদ্ধ, যে শারিরীকভাবে অশক্ত কিন্তু ইন্দ্রিয়ের রূপাকাঙ্ক্ষা তীব্র। সমগ্র পরিমন্ডলের সঙ্গে মায়ার রূপও সে উপভোগ করে, চোখ দিয়ে, শ্রুতি ও ঘ্রান দিয়ে নৈকট্যের তাপ দিয়ে - কেবল স্পর্শ করে না। এই রূপময় ইন্দ্রিয়ভোগের গল্প 'শিরশিটি'।[১৭] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য বলেছেন -

> 'শিরশিটি' গল্পে বুড়োটা দেখে ভাড়াটে বাড়ির বৌটির স্নানের দৃশ্য। বুড়োটার মধ্যে যৌন বাসনা নেই, সে দেখে এক উদ্ভাসিত রূপের দৃশ্য ... মেয়েটিও দেখে, সে দেখে নির্জনতার মধ্যে কুয়োতলার শ্যাওলায় পড়েছে রোদ কচু গাছে উড়ে এসে বসে প্রজাপতি, জলের চিক্কন ধারা, একটা শিরশিটি সব মিলিয়ে এক রূপ। বস্তুতঃ বুড়ো ও মেয়েটি একই রূপ দেখছে, যাকে বলা যায় নিখিল বিশ্বের রূপ - বুড়ো ও নগ্ন মেয়েটিও ওতোপ্রোত-ভাবে যার অন্তর্গত।[১৮]

কিন্তু একটু গভীর ভাবে গল্পটিকে বিশ্লেষণ করলে সুষিতা চক্রবর্তীর মতকে সমর্থন করে বলা যায় যে 'শিরশিটি' গল্প ঠিক লালসাহীন রূপভোগের গল্প নয়। বৃদ্ধ ভুবন এবং যুবতী মায়ার মনের লালসা অথবা বলা যায় যৌন সংবেদনা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের

ব্যবহারে গল্পে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যে মানুষকে মায়া একটা মরা গাছের মতো মনে করতো সেই মরা গাছে কখন যে সবুজের আভা লেগেছে তা সে অনুভব করতে পারেনি। কিন্তু যখন সেটা বুঝতে পেরেছে তখন সে ভয় এবং কান্না দুটোকেই জয় করে তার উষ্ণ কোমল হাত সেই মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়েছে অবলীলা ক্রমে। এ গল্প সম্পর্কেও লেখক তার বাল্য স্মৃতির উল্লেখ করেছেন -

> ... হালুইকরের গিন্নি ছিল ভয়ানক সুন্দরী। ... হাঁসের গায়ের গন্ধ, খানা ডোবার গন্ধ, স্যাঁতস্যাঁতে উঠোন আর ওদিকে হালুইকরের কড়া থেকে উঠে আসা খাঁটি ভয়সা-ঘি লুচি পাঁপড় ভাজার গন্ধের স্মৃতি দীর্ঘকাল আমার নাকে লেগেছিল।[১৯]

'গিরগিটি' গল্পটি জ্যোতিরিন্দ্রের বিখ্যাত গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম। অপূর্ব ভাষা প্রয়োগে মানুষের মনের যে রূপমোহ, তাকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।' এই গল্পে ক্রমশ দেখা যায় 'গাছ আর ফুলফলের জগৎ ছাড়িয়ে গিয়ে প্রাণীজগৎ নিঃশব্দ চক্রান্তে প্রবেশ করছে দুজনের দেখায়।'[২০] যেমন ডালিম গাছের শরীর, করবীফুলের থুতনির পর রাজহংসীর গতিভঙ্গি পেরিয়ে বৃদ্ধভুবন মায়ার চোখে দেখতে পায় 'বাঘিনী বনের মধ্যে শিকার' খুঁজছে' সেই রকম দৃষ্টি। বিশুদ্ধ দৃষ্টির সম্ভোগের আনন্দে একটা মানুষ গাছ হয়ে উঠতে পারে, শরীরের ক্ষমতা না থাকলে সে অগত্যা গাছ হয় বটে, কিন্তু 'ক্ষমতা যদি থাকতো গাছ হতো গিরগিটি।'[২১] 'চিতাবাঘিনী'র চিত্রকল্প জ্যোতিরিন্দ্র 'গিরগিটি' গল্প ছাড়াও প্রথম পর্বের গল্প 'মঙ্গলগ্রহ'তেও ব্যবহার করেছেন। 'গিরগিটি' গল্পটি প্রথমে 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, কিন্তু পুরো গল্পটি পত্রিকার জন্য দেওয়া হয়নি, পুরো গল্পটি 'প্রিয় অপ্রিয়' গল্প গ্রন্থে স্থান পায়। কিন্তু তার 'শ্রেষ্ঠ গল্প'তে 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা গল্পটিই দিয়েছিলেন।'[২২]

প্রকৃতি যে সবার ধাতে সয় না, এই প্রকৃতিই মানুষকে কখনো দেয় ইন্দ্রিয়জ সুখ আবার কখন মানুষকে সে ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করায়। এই পর্বে কিছু গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র অন্যান্য প্রকৃতি সচেতন গল্পকারদের মতো প্রকৃতির সৌন্দর্যের শুধু বন্দনা করেন নি, বরং প্রকৃতির সংস্পর্শে এলে মানুষের অবচেতন মনের যে প্রকাশ ঘটে, জেগে ওঠে বিস্তৃত আকাঙ্ক্ষা - নিরাবরণ আদিম মুক্তি, সে খোঁজে - একেই লেখক এই পর্বের কিছু গল্পে ধরতে চেয়েছেন। যেটা প্রথম পর্বে গল্পে এভাবে হয়তো পাওয়া যায় না। তাঁর 'পতঙ্গ' গল্প গ্রন্থের (১৯৬০) অন্যতম গল্প হল 'পতঙ্গ'। এই গল্পের প্রাকৃতিক পটভূমি হল সবুজমাঠ, গুলমোহর ফুলের গাছ, সেখানে রয়েছে দিনরাত অশ্রান্ত সোনাঝুরা সকাল বিকেল। সোনা রঙের গুল-মোহর ফুল আর রৌদ্রের তাপ পলাশের মতো তরুণের মনের সব কিছু পাল্টে দিয়ে-ছিল, অথবা গল্পের যেখানে অস্তিত্ব বিকেল - 'ছায়া লম্বা হয়ে গেছে, পাখী উড়ছে। রঙীন প্রজাপতি চোখে পড়ল। লাল টুকটুকে এক ঝাঁক ফড়িং দেখলাম মাঠের ঘাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে নামছে। এক পা এক পা করে গোলমোহরের গাছের তলা দিয়ে আবার সেই ফ্ল্যাটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। আমার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমার নিয়তিই আমাকে আবার সেখানে টেনে নিয়ে গেল।'[২৩] একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে এ গল্পে নিয়তি এবং প্রকৃতি এক অভিন্ন সত্তা লাভ করেছে। মানুষ প্রকৃতির কাছে অতি তুচ্ছ নগন্য, তার আকর্ষণ অমোঘ। সেই আকর্ষণই গল্পের পরিণতিতে পলাশের মনে হত্যার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। গোলমোহরের সেই আগুন পলাশের মনের শান্তি সংযম কেড়ে নিয়েছিল, আর তাই সে শেষ পর্যন্ত হত্যা করতে বাধ্য হয়। এ গল্পে হত্যার প্রসঙ্গে 'মুরগী কাটা'র কথা আনা হয়েছে। মুরগী খাবার প্রসঙ্গ আবার রয়েছে তার 'রাবণ বধ' গল্পেও। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন -

... মুরগি কাটার প্রসঙ্গ এসে গেছে - সেটাও বোধ হয়
বৌদির কামনাসিক্ত লোভকে বোঝানোর জন্য ...।[২৪]

এই ধরনের চিত্রকল্প ধ্রুবপদের মতো এসেছে তার বিভিন্ন গল্পের মধ্যে।

প্রকৃতি কখনো কখনো মানবিক সম্পর্কের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। বিশেষ প্রাকৃতিক পটভূমিতে মানুষের মনে কীভাবে হত্যার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তার বর্ণনা পাই 'সমুদ্র' গল্পে। প্রকৃতির এক ভয়াল স্বরূপ ফুটে উঠেছে এই গল্পে। কালো জলের অশান্ত গর্জনের মধ্যে সমুদ্রের কেবল ভয়ংকর ক্ষুধার রূপ সে দেখে সমুদ্রের ফেনা হয়ে যায় ঝকঝকে মসৃণ নিষ্ঠুর দাঁতের সারি। লেখক প্রকৃতির ক্ষুধার রূপ ভয়াল রূপের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির মনুচৈতন্যের আদিম হিংস্র স্বরূপ প্রকাশিত হয় কীভাবে তা দেখাতে চেয়েছেন। পাঠকের গভীরতম সত্তার মধ্যে এ গল্পের ভয়ংকর হিংস্রতা আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'বনের রাজা'তে তিনি হয়েছেন প্রকৃতির শান্তরূপের মধ্যে। আবার কিছু গল্পে দেখিয়েছেন প্রকৃতির ভয়ংকর ক্ষুধার্তের রূপ যা প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনুচৈতন্যের প্রতিফলন, মানুষ সমস্তকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে তখনও সে প্রকৃতির সঙ্গেই থাকতেই চাইছে - এরকম বিচ্ছিন্ন মানুষকে দেখা যায় 'নৈশভ্রমণ' গল্পে। এই গল্প লেখার বিষয়ে লেখক বলেছেন -

আমি যখন 'নৈশভ্রমণ' গল্প লিখি তখন আগে যে পাড়ায়
থাকতাম সেখানে একটা রেল লাইন ছিল। সেই রেল লাইনের
পাশে একটা ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল ছিল। আমি রোজই চেয়ে দেখতাম
যে নীল, সবুজ, লাল এই সব আলোগুলি জ্বলত নিবত।
... এই যে বিচ্ছিন্নতাবোধ আর একা-একা চলা ফেরা করা
কোনো সঙ্গী না নিয়ে এইটেই আমার নৈশভ্রমণ গল্প লেখার
গোড়ার দিকের কথা।[২৫]

এ গল্পে লেখক প্রকৃতির নির্জনতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির মনের বিচ্ছিন্নতা বোধকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। গল্পের শেষেও তাই দেখা যায় মানুষটি তার নিঃসঙ্গতাকে নির্জন-পরিবেশের মধ্যে অতি যত্নে লালন করতে চান। লেখক নিজেও বলেছেন -

> ঐ নির্জনতার মধ্যে নানা রকম আলো জ্বলছে নিবছে, হঠাৎ দেখে মনের মধ্যে অন্যরকম আবহাওয়া তৈরি হয়ে যায়, একটা পরিবেশ চেতনা জন্ম নেয়।[২৬]

প্রথম পর্বের গল্পের মতো দ্বিতীয় পর্বের গল্পেও দেখা যায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অসহায়তার কথা যেমন 'রাক্ষসী' গল্পের মেয়েটি অভাবের তাড়নায় অবশেষে নিজেকে বিক্রি করে, পরিবারের কেউ সেজন্য তাকে শাসন করে না সে বোঝে মানবিকসত্তা হারিয়ে সে রাক্ষসী হয়ে উঠছে। সাহিত্যের বেচা কেনার যুগে নিজের সৃষ্টির কাছে আত্মনিবেদিত দরিদ্র এক লেখককে পাওয়া যায় তাঁর 'অমর কবিতা' (১৯৬৪ দেশ) গল্পে। এ গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র দেখিয়েছেন দরিদ্র লেখককে দৈনন্দিন জীবনে কী অপমান আর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। তাঁর 'এই তার পুরস্কার' উপন্যাসে এর আভাস অবশ্য পাওয়া যায়।

তৃতীয় পর্ব (১৯৭২-১৯৮২)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জীবনের প্রথম দিকে রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, এবং কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে কলকাতায় চলে আসার পর রাজনীতির সঙ্গে আর কোন যোগাযোগই রাখেন নি। অহিংসা নিয়ে বড়ো একটা উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা তার ছিল, শেষ জীবনেও যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিবৃত্ত নিয়ে তার আগ্রহ ছিল সেটা বোঝা যায়। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী অধ্যায়ে দেশের রাজনীতির যে

গতিপথ, তার সঙ্গে তিনি একেবারেই চলতে পারেন নি। আর এই তাল মিলিয়ে না চলতে পারাতেই তিনি কিছুটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। রাজনৈতিক দল বা নেতাদের সমর্থন করে তাদের দলে থেকে যে সব লেখকেরা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে আগ্রহী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাদের দলের ছিলেন না, আর তাই তার শেষ জীবনের গল্পে দেখা যায় অর্থহীন রাজনীতিকে তিনি ব্যঙ্গ করছেন। ১৯৭৬-এর শেষে বা ১৯৭৭-এর প্রথমে 'পিলসুজ' পত্রিকার এক প্রশ্নোত্তরে তিনি জানিয়ে ছিলেন যে 'সোশ্যাল কমিটমেন্ট' যদি শিল্পের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে শিল্প সৃষ্টি সেখানে গৌণ হয়ে ওঠে এবং শিল্পের সজীবতার সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়।'[২৭] ১৯৮১ সালের লেখা একটি আত্ম-কথায় তিনি তাঁর এই অবস্থানে অবিচলিত ছিলেন যে 'কোন শিল্পীই কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ও গন্ডির মধ্যে আটক থাকতে পারে না। ... স্বাধীনতা তার জরুরি। কোনো আরোপিত নিয়মশৃঙখলা বা বাধ্যবাধকতা শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।'[২৮] তাঁর শেষ জীবনে দেখা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি যে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন তা বোঝা যায় ১৯৭১ সালে প্রকাশিত 'বিকালের খেলা' গল্পটিতে। গল্পটিতে দুটি শিশুকে পাই, যারা বর্তমান জীবনের ফ্ল্যাট বাড়ির গ্রিলের গরাদে বন্দী। বাস্তবজীবন সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে না। তারা একদিন পথে বের হল এবং একটি পরিচিত বিষয়ের আওয়াজের মুখোমুখি হল। এই জিনিস তারা ভালবোঝে তারা দেখল। নিশান উড়ছে ইনক্লাব জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ। এই শিশুদেরই বাড়ির ছাদে একদিন রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল, যাদের একজনের জামায় একটুকরো কাগজে কাঁচা হাতে লেখা 'বাবলু পারটি, আর একজনের জামায় 'পিন্টু পার্টি' আটকানো। মুখের ছেলে-মানুষির কথা ডাডাইস্টরা অনেকদিন আগে লিখেছিলেন। কিন্তু শিশুরা নিজেদের মুখ দিয়ে ভয়ংকরভাবে কখনো কখনো বড় মানুষদের মুখের ছেলেমানুষিকে, রাজনীতি নিয়ে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব যে কত অর্থহীন তা বুঝিয়ে দেয়। 'ইনক্লাব

জিন্দাবাদ' শ্লোগানটি ব্যবহার করে গল্পে লেখক তার তীব্র শ্লেষকেই প্রকাশ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো বাংলা সাহিত্যে বিশেষ শ্লোগান ব্যবহার করে রাজনীতিকে ব্যঙ্গ করা খুব কম লেখকের মধ্যেই দেখা যায়। এই রকম শ্লেষ আবার দেখা যায় তার 'হিমির সাইকেল শেখা' গল্পে। বস্তির পাশে তেতলা বিল্ডিং ভাল মানাবে বলেই সে সেখানে বিল্ডিং বানিয়েছে : তাদের ছেলে বাবলু বস্তির মেয়ে হিমিকে সাইকেল শেখায়। বাবলুর মা এতে খুশি হয়, কিন্তু জগদীশ বলে - বাবলু রাজনীতি করছে' এই ছেলে লিডার হবে।''গরিবি হঠাও, গরিবি হঠাও' এই ধ্বনি তিনি বারংবার ব্যবহার করেছেন গল্পটিতে। সত্তর দশকের দুর্বৃত্ত কংগ্রেস সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রের তীব্র ঘৃণা যেন এ গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। 'বাক্যের কাটা কাটা গড়নে কয়েকটি বাক্যগুচ্ছের অনবরত আবর্তনে শ্লেষ একেবারে জমজমাট হয়ে উঠেছে'২৯ - এ গল্পে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল প্রজন্মের ব্যবধান। এই ঘটনাকে তিনি তুলে ধরেছেন 'হার' গল্পে। এ গল্পটি ১৯৭৩ সালে দেশ পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ গল্পে দেখা যায় বাবা ও ছেলের মধ্যে একটা দেওয়াল তৈরি হচ্ছে এবং বাবা এই দেওয়ালের ভাষা ঠিক পড়তে পারছে না। কিন্তু এই ব্যবধান যে গড়ে উঠেছে সেটা উভয়েই বুঝতে পারছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই ভাঙাচোরা সমাজে মানুষেরা অবক্ষয়িত হচ্ছে, সেই সঙ্গে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে চারিদিক থেকে - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তার গল্পে সেই প্রসঙ্গ এনেছেন। নিজের প্রজন্মের হাত ধরে মানুষ যে জীবনের পথে এগিয়ে যাবে সে সম্ভাবনাও বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন সমাজে নেই। মানুষ যে সেখানেও একা হয়ে পড়ছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজের সমাজে দাঁড়িয়ে সেটা অনুভব করেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর শেষ জীবনে পর্যাপ্ত পরিমানে কাফকা'র রচনা পড়েছিলেন এক ধরনের নিঃসঙ্গতাবোধ তখন তার নিজেকে ঘিরে এবং নিজের শহরকে ঘিরে হয়তো গড়ে উঠেছিল। এই নিঃসঙ্গতা থেকেই মানুষযে নিজের এবং তার চার-পাশের মানুষদের আত্ম-পরিচয়কে হারিয়ে ফেলছে সেটা দেখা যায় ১৯৮০ সালে প্রকাশিত 'মুখ' গল্পে। এই গল্পের মানুষটি একসময় লক্ষ্য করল যে বিভিন্ন পশু পাখি, কীটপতঙ্গের মুখের আকৃতির সঙ্গে তার চারপাশে থাকা মানুষজনদের মুখের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন কাকের মুখে বাড়িওয়ালা বিধু নন্দীর মুখ, সাদা দেওয়ালে টিকটিকিকে মনে হয়ছে পাশের ফ্ল্যাটে কিশোরী কুমকুম । অথবা পেটমোটা কালো একটা ভোমরাকে মনে হল অন্তঃসত্তা কাজের মেয়ে যামিনী। তার মনে হতে লাগল নৈতিক অধঃপতন থেকে তার মধ্যে এক ধরনের ব্যাধির বীজ বাসা বেঁধেছে এবং এর থেকে রেহাই নেই। এই মনোভাব থেকেই সে পোস্ট অফিসের নির্জন কাউনটার থেকে অকারণে কেবল বাঘ, সিংহ, হাতি, হরিণের ছবি যুক্ত স্ট্যাম্প কিনতে চায়। কারণ তাতে মানুষের স্পর্শ নেই। পরিকল্পনা বা বিদ্যুৎ-ইঞ্জিনের স্টাম্পের প্রতি তার আগ্রহ নেই কারণ তাতে মানুষের সংস্পর্শে আছে। শহরের সভ্যতা, আধুনিকতা মানুষকে শহর বিমুখ করে তুলেছে, মানুষ হয়ে উঠছে নিঃসঙ্গ। মানুষ নিজের মধ্যে নিজের সত্তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। কাফা'র 'মেটামরফসিস'এও এভাবেই মানুষের পোকাতে পরিণত হয়ে যাবার কথা রয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মুখ গল্পের সঙ্গে কাফ্কার এই গল্পের হয়তো কিছুটা সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে অবশ্যই সেটা মানুষের রূপান্তরের ক্ষেত্রে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক পট পরিবর্তনে মানুষের জীবন ধারা চলেছে বৃত্ত থেকে বৃত্তান্তরে। আর সেখানে মানুষ কখনো দাড়িয়ে আছে প্রজন্মের ব্যবধানে, কখনো বা একেবারেই নিঃসঙ্গ অবস্থায়। জ্যোতিরিন্দ্রের তৃতীয় পর্বের গল্পে এই নিঃসঙ্গতাকে আমরা দেখতে পাই। বর্তমান সমাজের সব দিকটাই যে ঘুন ধরে গেছে, মানুষে

মানুষে সম্পর্ক শুধু মাত্র স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে আছে তাকেই তিনি দেখিয়েছেন 'ওয়াং ও খেলা ঘরে আমরা'(১৯৭১) গল্পে। ১৯৭৮-এর শেষ দিকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গুরুতর ভাবে অসুস্থ অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি এ দীর্ঘ গল্প লেখেন। তিনি 'প্রায়ই বলতেন এই গল্পের কথা।'[৩০] গল্পটি একটি হাসপাতালকে কেন্দ্র করে যেখানে সমস্ত রোগীই রক্তশূন্যতায় ভুগছে। অথচ রক্ত কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, শুরু হয়েছে রক্ত সংগ্রহের প্রতিযোগিতা। এই প্রতি-যোগিতা থেকে দুজন সরে এসেছে। একজনের অর্থবল নেই বলে, অন্যজন জুতোর দোকানের চীনা মালিক 'ওয়াং', সে স্বেচ্ছায় সরে এসেছে অর্থবল জনবল থাকা সত্ত্বেও। কিন্তু রক্ত দেওয়া আর রক্ত পাওয়া টানাপোড়েনে মনুষত্বের যে ভয়ংকর স্বার্থপর চেহারা আর অন্যদিকে অসহায়তা, তা দেখেই ওয়াং রক্তের বিনিময়ে আর জীবন পেতে আগ্রহী হলো না, মৃত্যুকেই সে বরণ করল। অন্যদিকে অর্থের অভাবে রক্ত না পেয়ে মৃত্যুপথযাত্রী উমাপদ দেখলো ওয়াং-এর প্রেতকে, যে বলছে 'আমি রক্ত চাই না। অল ব্যাড ব্লাড, অল পলিউটেড - পৃথিবী সব রক্ত খারাপ হয়ে গেছে। ... দিস ইজ এ উইকেড্ ওয়ার্ল্ড অলথ্যান করাপটেড্।' বর্তমান অবক্ষয়িত সমাজকে বর্ণনা করতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই দুঃসাহসীক উক্তি ওয়াং-এর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। পৃথিবীতে শুধু প্রাকৃতিক পলিউশন-ই ঘটছে না তার থেকেও ভয়ংকর পলিউশন মানব সমাজের মধ্যে চলেছে যা সমাজের ভিতকে একেবারে মূল থেকে ক্ষয় করে দিচ্ছে, সেটা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী অনুভব করেছিলেন।

এই অবক্ষয়িত সমাজে, কলুষিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায়, রাজনীতির বিভ্রান্তি আর বিকৃতির শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশী সমাজের শিশুরা যারা ভবিষ্যতের নাগরিক, সে চিত্র দেখা গেছে 'বিকেলের খেলা' বা 'হিমির সাইকেল শেখা' গল্পে।

এই সমাজে শিশুরা যে খুব একটা ভাল পরিস্থিতিতে নেই সেটা দেখা যায় তার মৃত্যুর এক বছর আগে লেখা 'ইস্টিকুটুম' গল্পে (১৯৮২, প্রকাশিত)। এ গল্পের নায়ক রুগ্ন অনাথ গণেশ নামের একটি শিশু, যাকে তার মাসি আশ্রয় দিয়েছে। তার রয়েছে শুধু সবুজের জগৎ। সে জগতে যেমন তক্ষক রয়েছে সে সঙ্গে রয়েছে পাখির ডাক - বিশেষ করে ইটিকুটুম পাখি। এ পাখি গনেশকে চেনে সে ডাকে 'কুটুম আয় কুটুম আয়।' কিন্তু সমাজের পরিস্থিতি এমন - চালের কেজি চারটাকায় উঠে গেছে, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে দরিদ্র ঘরে একমুঠো ভাত দেবার ভয়ে, আর একমুঠো ভাত খাবার লজ্জায় কুটুম বাড়ি কুটুমের আসা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু গনেশ তার সবুজ জগৎটুকু নিয়েও থাকতে পারলো না। সামাজিক পরিস্থিতি এমন হয়েছে যেখানে শিশুরাও বড়ই অসহায়। শঠ, প্রলুব্ধ আত্মীয়েরা অনাথ গনেশ বা তার মতো শিশুদের সবুজ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছেলেধরা দলের কাছে বিক্রি করে দেয়। সবুজ জগৎ থেকে শিশুরা নির্বাসিত হয়ে অবস্থান করে গুমোট এক অন্ধকার জগতে। এ জগতে শিশুরাও শিশুদের সহানুভূতি দেখায় না, তারাও একে অপরের প্রতি অতি নির্মম ভয়ংকর হয়ে ওঠে। গনেশ মানুষের এই ভয়ংকর পরিবেশ থেকে তক্ষকের ডাককে কম ভয় পায়। সেভাবে এখানকার চেয়ে তক্ষকের ডাক ভালো, ভয় কম। জ্যোতিরিন্দ্র দেখেছিলেন সমাজের বিনিপাতে মানুষ আজ দগ্ধ, বিবিক্ত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম দিকের রচনার বিষয় এবং লেখার কৌশল পরবর্তী কালের রচনায় ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে ধীমান দাশ গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নিজের রচনা শিল্প সম্পর্কে লেখক বলেছিলেন 'যা সরাসরিও বলা যায় তা আমি আঙ্গিকগত খুঁটিনাটির মাধ্যমে বলার কথা ভাবি।'[৩৫] আবার ১৯৮২ সালে আর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন 'আমি এখন টেকনিকটাকে আরো বেশি ফ্রি করতে চাই, যেন তা আলো বাতাসের মতো চরিত্র এবং পরিবেশের সঙ্গে মিলে যায়। খুব সাধারণ, খুব

সহজ শব্দ যদি এসে যায় আমি ওই শব্দই দেব। ... আমার লেখায় তাই আজ উপমা কমেছে, আমি ইচ্ছে করেই কমিয়ে দিয়েছি।'[৩১] যেমন প্রথমদিকে গল্প 'নদী ও নারী'তে উপমা ব্যবহার হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমানে, একটি নারীর অস্বাভাবিক জীবন যাপনকে তুলে ধরেছে বিভিন্ন উপমা প্রয়োগে - নির্মলার কাছে এই নারীর 'গানের রেশটা কুৎসিত সরীসৃপের মতো তার কানের কাছে কিলবিল করছিল' অথবা 'দীর্ঘছন্দ নিটোল নিভাঁজ গড়ন কোমরে আঁট করে জড়ানো আঁচলটা, হলদে ছোপ দেওয়া শাড়িতে মেয়েটাকে দেখাচ্ছিল একটা চিতা বাঘের মতো।' অথবা তার দৃষ্টি হল 'মধ্যাহ্নের আকাশের মতন সুচ্ছ প্রখর।' অথবা 'মঙ্গলগ্রহ গল্পে লীলাময়ীকে প্রৌঢ় কুলদারঞ্জনের মনে হল 'মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশব্দচারিনী কোনো বাঘিনী। ... সুন্দর, গর্বিত, নির্ভীক।" কিন্তু ক্রমশ উপমা ব্যবহার কমেছে তার গল্পে এবং শেষ দিকের গল্পে অনেক সরাসরি ভাবে সমাজের অবস্থাকে দেখাতে চেয়েছেন। সে ক্ষেত্রে গল্পের মধ্যে তিনি বিশেষ বিশেষ শব্দের বারংবার ব্যবহার করেছেন। যেমন 'বিলালের খেলা'তে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বা 'হিমির সাইকেল শেখা'তে 'গরিবি হটাও' ইত্যাদি। উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে জীবনানন্দ দাসের একটা মিল যেমন দেখা যায়, ঠিক সেভাবেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতোই জীবনানন্দের শেষ দিকের অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭-এর লেখাতেও ক্রমশ উপমা ব্যবহার কম দেখা যায়। যেমন '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় দেখা যায় -

> অন্ধকার হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পাপে
> যে অনবনমনে চলেছে আজো ...[৩২]

অথবা 'পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে' কবিতায় -

> পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরে গেলে দিন আলোকিত হয়ে
> ওঠে - রাত্রি অন্ধকার হয়ে আসে ...

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম দিকের লেখায় প্যাশন, রূপের বর্ণনা ইত্যাদিই প্রাধান্য পেয়েছে। সে কারণে লেখায় ভাষা বা বর্ণনার অলঙ্করণ ঘটেছে, যা লেখকের মতে তার গল্পগুলিকে অযথা ভারি করেছে। এই ভার শব্দের ব্যবহারে, উপমায় দৃষ্টান্তে। কিন্তু শেষের দিকের লেখায় এই ভাষার বাহুল্যকে তিনি বর্জন করেছেন, রচনা হয়ে উঠেছে নিরাভরণ। যেমন 'গাছ' গল্পটিতে জ্যোতিরিন্দ্র যেন ছবি এঁকেছেন। এ গল্পে 'বর্ণ-প্রতীকের জীবন্ত চলিষ্ণুতা লক্ষ করার মতো। লালের স্পর্শ পেয়েই ঈর্ষার সবুজ এখানে প্রেমের আর প্রাণের সবুজে গোত্রান্তরিত হয়েছে।'[৩৩] গাছে মধ্যে তিনি মানবসত্তা আরোপ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের অন্যতম বিশেষত্ব হল - মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক সত্তা আরোপ করা, আবার প্রকৃতির মধ্যে মানবসত্তা আরোপ করা। এই অভিনব কৌশল বাংলা সাহিত্যে খুব কম লেখকই অবলম্বন করেছেন। বিমল কর লিখেছিলেন 'জ্যোতিদার লেখার বড় গুণ তার চিত্র কর্ম'।[৩৪] যেখানে তিনি প্রকৃতির রূপ বর্ণনা করেছেন সেখানেই তাঁর চিত্রকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার সমাজের যা আপাত অসুন্দর তার ছবিও তিনি নিপুন শিল্পীর মতো অঙ্কন করেছেন। বুদ্ধদেব বসু যেভাবে জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধে বলেছিলেন সেই ভাবে আমরা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সম্বন্ধে বলতে পারি, তার গল্প 'বর্ণনা বহুল, তার বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তার চিত্র বর্ণবহুল ...'[৩৫]। জীবনানন্দের মতো জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের 'এ সব উপমা ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতির রহস্যলোকে।'[৩৬] নিসর্গের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে শহর-বস্তি পার্ক-ডাস্টবিনের ছবি ও তার গল্পে সমান ভাবে স্থান করে নিয়েছে। 'সর্ব ইন্দ্রিয়ের সম্মেলক ভাষা তার অঙ্কনকে ঘনত্ব দিয়েছে।'[৩৭] তার ছোট গল্পের শিল্পগুণ উপন্যাসের চেয়ে বেশি বলে মনে হয়, তার কারণ তিনি ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি অনুচ্ছেদের বিন্যাস অতি নিখুঁত ভাবে করেছেন। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তিনি পরিণামী উন্মোচন কৌশলের ওপরে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই উন্মোচন

ঘটনার নয়, বলা যেতে পারে উপলব্ধির উন্মোচন।'[৩৮] যেমন 'তারিনীর বাড়ি বদল' 'বনের রাজা' বা গিরগিটি', 'পতঙ্গ' অথবা শেষ পর্বের গল্প 'ইন্টিকুটুম'এ এই উপলব্ধি উন্মোচন ঘটেছে। তার অনেক গল্পই আখ্যান প্রধান নয়। আর সেক্ষেত্রে স্পষ্ট ঘটনা কেন্দ্রিক উন্মোচনের পরিবর্তে উপমা-চকিত, সংকেতবন্ধ প্রতীকী বাক্য বা দৃশ্যে প্রায়ই তার গল্প শেষ হয়।'[৩৯] যেমন 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' গল্পের শেষ হয়েছে সংকেত বন্ধ প্রতীকী বাক্যে - 'তা অত ভাবতে হবে না বৌ - সেরে যাবে। পায়ের কাটা ঘা কদিন থাকে, ঘা শুকোয় না মনের।'[৪০] অথবা শ্বাপদ গল্পের শেষে বক্তা বলছে -

> ... যাকে বুনো বলতাম ... সে আর মানুষের আকৃতি
> নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে
> মিশে গিয়েছিল আর সেই অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের
> ঝকমকে মেয়ে বুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।[৪১]

আবার কোন গল্পে বিভিন্ন প্রসঙ্গ বা চরিত্র প্রতীকের দ্যোতনাময়তা লাভ করেছে যেমন 'শালিক কি চড়ুই' গল্পে দুটি পাখির গতিবিধি ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে পল্লব সেনের গতিবিধির সঙ্গে। অবশেষে বলা যায় তার প্রায় গল্পেই ছড়িয়ে আছে এক ধরনের কবিত্ব যা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত।

তথ্যপঞ্জী

১. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'আমার সাহিত্য জীবন', - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, সম্পাদক-সুব্রত রাহা, অজয় দাশগুপ্ত, ১৯৯৩, প্রকাশক- বিবেশ ভারতী, পৃ.২৯১

২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী' - 'যা দেখি যা শুনি' - নাথ পাবলিশার্স, পৃ.১৩৪

৩. তদেব পৃ.১৩৮

৪. তদেব পৃ.১৩৯

৫. তদেব পৃ.১৪০

৬. সুব্রত রাহা - 'অন্ধকারে নির্মোহ এক চিত্রকর' - কালপুরুষ, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ.১৪৮

৭. লোথার লুৎসে - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার - কালপুরুষ পত্রিকার সৌজন্যে - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প - সম্পাদক

৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - 'নীলরাত্রি ও বনের রাজা' - দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৬, পৃ.২২৫

৯. প্রশান্ত মাজী - চা-টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিবিম্ব, ত্রয়োদশ সংকলন ১৯৭৯ পৃ.২

১০. সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে একটি সন্ধ্যা - কালপুরুষ, ৫ম বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ.১২০

১১. সুব্রত রুদ্রের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিষয়ে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (গবেষকের)

১২. সুব্রত রুদ্র - জ্যোতিরিন্দ্রনন্দী যখন যাচ্ছেন' - যযপুরিতে কবিতা, ১৩৯২, পৃ.৩৪

১৩. তপোব্রত ঘোষ - সবুজ মানুষের জন্ম - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প, ভাঙা কাঁচের শিল্প, বাংলা ছোট গল্পের শিল্পীদল, সম্পাদক - অর্জুন রায়, প্রয়াস প্রকাশন - পৃ.১০০

১৪. ধীমান দাশগুপ্ত - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আঙ্গিক - অবহি (নবপর্যায়) ১৯৮২, প্রথম সংখ্যা। পৃ.১৩

১৫. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'আমার সাহিত্য জীবন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, ১৯৯৩, সম্পাদনা সুব্রত রাহা - অজয় দাশগুপ্ত, পৃ.৩০৩

১৬. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'গাছ' - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, ১৯৮১ সম্পাদনা - নিতাই বসু, পৃ.৩০৬

১৭. সুমিতা চক্রবর্তী - গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - কলেজ স্ট্রিট, নববর্ষ, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ.৪৮

১৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - নীলরাত্রি ও বনের রাজা, দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৬, পৃ.২২৭

১৯. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - আমার সাহিত্য জীবন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, ১৯৯৩, সম্পাদনা - সুব্রত রাহা - অজয় দাশগুপ্ত, পৃ.২৯৫

২০. তপোব্রত ঘোষ - সবুজ মানুষের জন্ম, ভাঙা কাঁচের শিল্প, বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদল, সম্পাদক - অর্জুন রায় , পৃ.১০৭

২১. তদেব, পৃ.১০৮

২২. প্রশান্ত যাজী - 'চা-টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' প্রতিবিম্ব, ত্রয়োদশ সংকলন ১৯৭৯, পৃ.১৫

২৩. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'পতঙ্গ' - পতঙ্গ গল্প গুচ্ছ ১৩৬৭, পৃ.১২৬

২৪. লোথার লুৎসার - 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার - কালপুরুষের সৌজন্যে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, সম্পাদনা - সুব্রত রুদ্র-অজয় দাশগুপ্ত, ১৯৯৩

২৫. তদেব

২৬. তদেব

২৭. শিলসুজ পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকার - শিলসুজ, ক্রমিক ২, সম্পাদক - অমিত রায়, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ ১৩৮৩

২৮. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - আমার সময় এবং আমার লেখা লেখি, 'নতুন সময়', পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৮১, পৃ.১১

২৯. তপোব্রত ঘোষ - সবুজ মানুষের জন্ম, ভাঙা কাঁচের শিল্প, বাংলা ছোটগল্পের শিল্পী দল, পৃ.১১৮

৩০. শচীন দাস - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'প্রথা' চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

৩১. ধীমান দাশগুপ্ত - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আঙ্গিক, আবহি, পঞ্চম সংখ্যা, ১৯৮২

৩২. জীবনানন্দ দাস - '১৯৪৬-৪৭', জীবনানন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৬, পৃ.১৩৪

৩৩. তপোব্রত ঘোষ - সবুজ মানুষের জন্ম, ভাঙাকাঁচের শিল্প, বাংলা ছোট গল্পের শিল্পীদল, পৃ.১২৯, সম্পাদক - অর্জুন রায়

৩৪. বিমল কর - ভূমিকা, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প, সম্পাদক - সুব্রত রাহা অজয় দাশগুপ্ত, ১৯৯৩

৩৫. বুদ্ধদেব বসু - কালের পুতুল, ১৯৫৯, পৃ.৩৬

৩৬. তদেব, পৃ.৫৩

৩৭. সুমিতা চক্রবর্তী - গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কলেজ স্ট্রীট ১১১৪
নববর্ষ-রবীন্দ্র সংখ্যা, পৃ.৫২

৩৮. তদেব, পৃ.৫২

৩৯. তদেব পৃ.৫২

৪০. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, ১১৮১, সম্পাদক - নিতাই বসু, পৃ.২৭০

৪১. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'সাপদ' - জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প, ১১৮১, নিতাই বসু, পৃ.১৩৬

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প গ্রন্থতালিকা

গল্পগ্রন্থ	প্রকাশনা	সাল	সূচী
খেলনা	পূর্বাশা লিঃ	জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩	নদী ও নারী, সন্ততি, সন্ধান, সিংহরাশি, সমতল, খাকী, খেলা।
শালিক কি চড়ুই	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ	৭ই বৈশাখ	শালিক কি চড়ুই, নায়ক নায়িকা, খুকী, চড়ুইভাতি, বধিরা, ভোলাবাবুর ভুল, খেলোয়াড়, চামচ, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী
চন্দ্রমল্লিকা	রথযাত্রা জ্ঞানতীর্থ	১৩৬১	চন্দ্রমল্লিকা, সিঁধেল, ডুবুরি, অমানুষিকা, কাঠপিঁপড়া, নিয়মের বাইরে, সিঁড়ি।
চার ইয়ার	শুভানী সাহিত্য উদ্যম	বৈশাখ ১৩৬১	চার ইয়ার, ···উত্তরায়ণ, রংচং, ভিজিট, ক্যামাক স্ট্রীটে
বন্ধুপত্নী	নাভানা	বৈশাখ ১৩৬২	বন্ধুপত্নী, মঙ্গলগ্রহ, দৃষ্টি, তারিণীর বাড়ি বদল, মেয়ে শাসন, দুপুরে গল্প।
ট্যাক্সিওয়ালা	ক্লাসিক প্রেস	১ বৈশাখ ১৩৬৩	ট্যাক্সিওয়ালা, ঘরণী, পালিশ, খুনী, মাছের দাম, কতক্ষণ, চশমখোর, ঘড়ির মানুষ।
বনানীর প্রেম	প্রকাশক, মদনমোহন	আষাঢ় ১৩৬৪	রজনীগন্ধা, গানের ফুল, রিফ্রিজারেটার, সন্দেশ, সূর্যমুখী, ইস্ত্রি, সোনার সিঁড়ি, নিষ্ঠুর, কমরেড, রিপোর্ট, আমার বন্ধু, বনানী প্রেম।

গল্পগ্রন্থ	প্রকাশনা	সাল	সূচী
পার্বতীপুরের বিকেল	প্রচারিকা	মাঘ ১৩৬৫	সোনার স্মৃতি, সার্কাস, বিষ, দুর্বোধ, পার্বতীপুরের বিকেল।
খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর	কথাকলি	২৫ বৈশাখ ১৩৬৭	কেষ্টনগরের পুতুল, পঙ্গু, মাছ-ধরার গল্প, নীল পেয়ালা, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর।
পতঙ্গ	কল্লোল প্রকাশনী	বৈশাখ ১৩৬৭	মৌচাক, টুকরো কাপড়, প্রতিনিধি, নৈশভ্রমণ, দিগ্‌দর্শন, রাক্ষসী, পতঙ্গ।
মহীয়সী	শ্রীলেখা পাবলিশার্স	বৈশাখ ১৩৬৭	মহীয়সী, বনের রাজা, গুইনি, সিন্ধেশ্বরের মৃত্যু, চোর, জ্বালা।
পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা	সেকাল-একাল	বিজয়া ১৩৬৮	তিনবুড়ি, গোঁয়ার, বৃষ্টির পরে, আপেল, সমুদ্র, উপহার, মৌসুমী, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা।
শ্বাপদ শয়তান ও রূপালী মাছেরা	ফসল	২৫ বৈশাখ ১৩৭০	শ্বাপদ, গন্ধ, শয়তান, রূপালী মাছ।
শ্রেষ্ঠ গল্প	ভারবী	অগ্রহায়ণ ১৩৮৩	নদী ও নারী, শালিক কি চড়ুই মঙ্গলগ্রহ, তারিণীর বাড়ি বদল, ট্যাক্‌সিওয়ালা, চোর, বনের রাজা, গিরগিটি, তিনবুড়ি, সমুদ্র, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, ভাত, আলোর পাখি, সেই ভদ্রলোক, জীবন, ছাতা, অজগর, সামনে চামেলি।

গল্পগ্রন্থ	প্রকাশনী	সাল	সূচী
ছিদ্র	বাণীশিল্প	শ্রাবণ ১৩৮৩	ছিদ্র, সোনার চাঁদ, বুনোওল, ক্ষুধা, হিংসা।
আজ কোথায় যাবেন	আনন্দ পাবলিশার্স	১৩৮৭	সোনালি দিন, আম কাঁঠালের ছুটি, দুই শিশু, লেডিজ ঘড়ি, আরসোলা, গোধূলি, ভাল ছেলে খারাপ ছেলে, চশমখোর, জিয়নকাঠি মরণ কাঠি, আজ কোথায় যাবেন, গোপন গন্ধ।
গল্প সংগ্রহ, ১ম খন্ড	বিশ্ববাণী প্রকাশনী	তারিখ নেই	আমার সাহিত্য জীবন, তাঁকে নিয়ে গল্প, এক ঝাঁক দেবশিশু, মহরা, কেমন হাসি, হার, মাছি, ওয়াং ও খেলা ঘরে আমরা, সুখী মানুষ, সংহার, ডলি মাল বসন্তকাল ও টি মজুমদার, গাছ, মিষ্টি জ্বালা, বাবু, চাওয়া, নিঃশব্দ নায়ক, বন্ধুপত্নী, মঙ্গলগ্রহ, দৃষ্টি।
জয়জয়ন্তী	নতুন প্রকাশক		বুড়ীর রস, বাদামতলা প্রতিভা, সোনার বিয়ে, ঋতুরঙ।
দিনের গল্প রাত্রির গান			দুঃস্বপ্ন, বিপত্নীক
প্রিয় অপ্রিয়	ডি-এম-লাইব্রেরি		কৈশোর, গিরগিটি, আটপৌরে বুটকি ছুটকি।
নির্বাচিত গল্প	দে'জ পাবলিসার্স	১৩৯৬	নদী ও নারী, রাইচরণের বাবরি, সমুদ্র, বৃষ্টির পরে, বনের রাজা, বন্ধুপত্নী, গিরগিটি

গল্পগ্রন্থ	প্রকাশনা	সাল	সূচী
			সাপদ, তারিণীর বাড়ি বদল, মঙ্গলগ্রহ, চোর, নীলপেয়ালা, চন্দ্রমল্লিকা, পার্বতীপুরের বিকেল, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, পতঙ্গ, পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা, জ্বালা, সামনে চায়েলি, গাছ
অপ্রকাশিত গল্প	প্রত্যয় প্রকাশনী মহালয়া	১৩৯৮	কালো বৌদি, আপন ভাই, ম্যাজিক, ফুল ফোটার দিন, রূপকথার রাজা।
বাহাই গল্প	বিবেক ভারতী	১৩৯৮	পালিশ, মিথুন, অবনি নিখোঁজ, মাছ, খাদক, হিমির সাইকেল শেখা, শয়তান, রুপোলি মাছ, আম কাঁঠালের ছুটি, যৌবন, ভূতির মার রেস্টুরেন্ট, তেলেভাজা, অমানুষিক, বাদামতলা প্রতিভা, গিরগিটি, কেমন হাসি, লেডিজ ঘড়ি, আরশোলা, গন্ধ, নীল পেয়ালা, এক ঝাঁক দেব-শিশু, অমর কবিতা, ইষ্টি-কুটুম, মঙ্গলগ্রহ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিছু রচনার সময়কাল

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - 'অন্তরালে' - ১৯৩০

'' - নদী ও নারী - ১৯৩৬ - পরিচয় পত্রিকা

'' - রাইচরণের বাবরি ১৯৩৬ - দেশ পত্রিকা

'' - পালিশ, মঙ্গলগ্রহ, কমরেড, বধিরা শালিক চড়ুই, শশাঙ্ক মল্লিকের নতুন বাড়ি, বনমীর প্রেম, ইত্যাদি গল্প ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে প্রকাশিত

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - বুটকিছুটকি - ১৯৫২

'' - তারিণীর বাড়ি বদল - ১৯৫৫-র কিছু আগে

'' - সূর্যমুখী (উপন্যাস) - ১৩৫৫ (১৯৪৮ দেশ)

'' - মীরার দুপুর(উপন্যাস) - ১৩৬০

'' - বারো ঘর এক উঠান (উপন্যাস) - ১৩

'' - গোলাপের নেশা - ১৩৬৬

'' - জ্বালা - ১৩৬৫ দেশ

'' - বনের রাজা - ১৩৬৬ দেশ

'' - অমর কবিতা - ১৯৬৪ - শারদীয় দেশ

'' - বিকালের খেলা - ১৯৭১

'' - হার - ১৯৭৩

'' - ভাল ছেলে খারাপ ছেলে - ১৩৮২ (১৯৭৫)

'' - লেডিজ ঘড়ি - ১৩৮৪ (১৯৭৭) দেশ

'' - ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা - ১৩৮৬ (১৯৭৯) দেশ

'' - মুখ - ১৯৮০

'' - ইন্টিকুটুম - ১৯৮২

'' - যতি ডাক্তারের গল্প - ১৩৮৯ (১৯৮২), দেশ পত্রিকা